বাংলা বিভাগ,6th Sem(Hons), (C-13), একালের গল্প।

বিষয় ঃ

সোমেন চন্দের ইঁদুর গল্পে মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিক টানাপোড়েন এবং তা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা কীভাবে ধরা পড়েছে।

অথবা

ইঁদুর গল্পটি একটি প্রতীকী গল্প রূপে কতখানি সার্থকতা লাভ করেছে।

১

শোষণ মুক্তির ইতিবাচকতায় দীপ্ত ঃ ইঁদুর

অনির্বাণ মান্না

যাঁর জীবন নিয়েই একটা ছোট গল্প লেখা যেতে পারতো কিম্বা উপন্যাস— সেই সোমেন চন্দ বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর নাম। সোমেন চন্দের আয়ুষ্কাল মাত্র একুশ বছর ন'মাস পনেরো দিনের। ডাক্তারী পড়াকালীন সোমেনের সঙ্গে আন্দামান ফেরৎ কমিউনিস্ট নেতা সতীশ পাকড়াশির সাক্ষাৎ ঘটে। সোমেনের ডাক্তারী পড়া সেখানেই সমাপ্ত হয়। ঢাকার দক্ষিণ মৈশুণ্ডিতে প্রগতি পাঠাগারে সোমেন পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহম করেন। নিষিদ্ধ কমিউনিষ্ট পার্টির 'কমিউনিস্ট পাঠচক্র'-এর প্রকাশ্য শাখা ছিল—এই প্রগতি পাঠাগার। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘেরও প্রধান সংগঠক ছিলেন সোমেন। এখানেই নানা কবিতা ও গল্পপাঠের আসর বসত। তাঁর অধিকাংশ গল্প প্রগতি লেখক সংঘে পঠিত হয়েছিল। এইভাবে কমিউনিস্ট জীবনদর্শনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে তার সক্রিয় কর্মধারার সমান্তরালে সাহিত্যসাধনার ক্রমপরিনতি লাভ ঘটেছিল সোমেন চন্দের জীবনে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। তার পূর্বে ১৯৪০-এ ঢাকার 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪১-এ তিনি ই. বি. রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই বিষয়ে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও পবিত্র সরকার সম্পাদিত 'আগুনের অক্ষর' গ্রন্থে বলা হয়েছে—"সে ঢাকা রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নে যোগ দিয়ে কাজ করতে লাগল; মজুরের বস্তিতে, কারখানার গেটে, এঞ্জিন

শেডের কাছে, কয়লার ধোয়ার নীচে দাঁড়িয়ে শোষিত শ্রমক্লান্ত মজুরদের সঙ্গে কথা কয়—ইউনিয়নের লাল পতাকার তলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহ দেয়। রেল মজুররা তাদের তরুণ নেতা সোমেনকে বিশ্বাস করত, ভালবাসত।"

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের চাইতে বয়সে সোমেন চন্দ বড় ছিলেন। দুজনের মধ্যে আমরা কোথাও যেন মিল খুঁজে পাই। একজন কবি, অন্যজন গল্পকার। কিন্তু উভয়েই অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। একজনকে যেতে হয়েছে ক্ষয়রোগে, অপরকে ঘাতকদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হতে হয়েছে। উভয়েই কমিউনিজিমে্ বিশ্বাসী। কিন্তু সোমেন চন্দকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল তাতে স্তম্ভিত হতে হয়, বাক্‌রোধ হয়ে আসে, ঘাতকবাহিনী—"ভোজালি দিয়ে পরপর আঘাত করে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয়, চোখ দুটি উপড়ে ফেলে, জিভ টেনে বের করে তা কেটে ফেলে দেয়, পেট চিরে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে দেয় এবং অট্টহাস্য করে পশুর মতো তারা তাঁর ছিন্নভিন্ন দেহের ওপর নাচতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতা ছিল, সোমেন শ্লোগানের পর শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছিলেন, শেষ পর্যন্ত রক্ত পতাকা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। (আগুনের অক্ষর : কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত ও পবিত্র সরকার সম্পাদিত)।

গল্পকার সোমেন তার জীবনের শেষ চার পাঁচ বছরে সাহিত্যচর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার ফসল বলতে মূলত চব্বিশটি ছোটগল্প, একটি উপন্যাস (বন্যা), দুটি একাঙ্কিকা এবং তিনটি গদ্য কবিতাকে উল্লেখ করা যায়। মাত্র সতেরো বছর বয়সে সোমেনের 'শিশুতপন' গল্পটি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর দুটি গল্প লেখা হয়—'ভালো না লাগার শেষ' এবং 'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেকদিনের একদিন' এই নামে। এছাড়াও 'স্বপ্ন', 'একটি রাত', 'সংকেত', 'দাঙ্গা', 'ইঁদুর', 'সত্যবতীর বিদায়', 'বনস্পতি', 'এক্স সোলজার', 'সিগারেট' ইত্যাদি ছোটগল্পগুলি লেখকের প্রতিভার সাক্ষী হয়ে ওঠে। 'দাঙ্গা', 'সংকেত' পুরোপুরি রাজনৈতিক গল্প। ইঁদুর গল্পেও রাজনীতির প্রসঙ্গ আছে।

সোমেনচন্দের ছোটগল্পগুলির মধ্যে অন্যতম গল্প হল ইঁদুর। গল্পটি 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে। 'ঐকতান' পত্রিকায় প্রকাশিত সোমেন চন্দের গল্প 'দাঙ্গা' ও 'ইঁদুর' ঃ পূর্বকথা ও পশ্চাৎপট' প্রবন্ধে কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—'১৯৪১-এ ডিসেম্বরে বড়দিনের ছুটিতে কয়েক দিনের জন্য ঢাকা থেকে কলকাতায় আসি। সঙ্গে করে নিয়ে আসি সোমেন চন্দের ইঁদুর গল্পটি। সোমেন চন্দের প্রায় সব গল্পই ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ঘরোয়া সভায় পড়া হয়েছিল। কিন্তু ইঁদুর গল্পটি ছিল সদ্যসমাপ্ত রচনা, আসবার সময় আমার হাতে দিয়ে সোমেন বলেছিল, গল্পটি 'পরিচয়' পত্রিকায় ছাপা হোক, এই তার ইচ্ছা।..... কিন্তু সোমেনের জীবদ্দশায় গল্পটির মুদ্রিত রূপ সে দেখে যেতে পারেনি। ৮ই মার্চ ১৯৪২-এ সোমেনের অপঘাতজনিত আকস্মিক মৃত্যুর

পরেই ইঁদুর গল্পটি পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সঙ্গে সঙ্গেই সেকালের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।" এই ইঁদুর গল্প পড়ে বাংলা সাহিত্যাকাশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অকাল পতনে মুজফ্‌ফর আহমদ হাহাকার করে উঠলেন। ইঁদুর গল্পের ইংরেজি অনুবাদ করলেন আশোক মিত্র। ১৯৬১-র রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে দুটি খণ্ডে সাগরময় ঘোষ প্রকাশ করেছিলেন 'শতবর্ষের শতগল্প'। তার দ্বিতীয় খণ্ডে 'ইঁদুর' গল্পটি স্থান পেয়ে চিরকালীন হয়ে রইল।

'একটি রাত' ও 'ইঁদুর' গল্পে একই নামের চরিত্র সুকুমারের দেখা পাই। আসলে এই সুকুমার আর কেউ নন, স্বয়ং লেখক। তাই আত্মজীবনীমূলক এই গল্পে উত্তম পুরুষের বাচন রীতির প্রয়োগ সার্থক ও অনুকূল হয়ে উঠেছে। কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্তের লেখা 'সোমেন চন্দের গল্প 'দাঙ্গা' ও 'ইঁদুর' : পূর্বকথা ও পশ্চাৎপট' থেকে জানতে পারি— 'ইঁদুর গল্পটিতে সংসারে অভাব-অনটনের চিত্র যে অসামান্য শিল্পরূপ পেয়েছে তার উপাদানগুলির কিছুটা অংশ সে সংগ্রহ করেছিল অবশ্যই নিজের পারিবারিক জীবনের প্রতিদিনের পরিবেশ থেকে।" সোমেনের মা সত্যিই ইঁদুরকে ভয় পেতেন। তাঁর দারিদ্র তেমন প্রকট না থাকলেও অভাববোধ ছিল। সোমেনকে দেওয়া পিতার উপদেশদান বাস্তবেও ঘটেছে। তবে মার প্রতি বাবার আশালীন আচরণ লেখক শিল্পের প্রয়োজনেই এনেছেন মনে হয়। ইঁদুর গল্পের শেষের দিকে রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের শ্রমিকদের কথোপকথন, আচরণের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতারই প্রকাশ।

ইঁদুর একটি শ্রেষ্ঠ প্রতীকী গল্প। গল্পকথক সুকুমার। ডাক নাম তাঁর সুকু। তাদের বাসায় ইঁদুরের বিস্ময়কর উৎপাত। গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে—'আমাদের বাসায় ইঁদুর এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেকা যাচ্ছে না।' ইঁদুরের সাহস দেখে গল্পকথক অবাক হন। 'দাঙ্গা' নামের ছোটগল্পে সোমেন চন্দ, সৈন্যকে ইঁদুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন—'একটা ইঁদুরের মতো ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে কে? একটি সৈন্য।' ইঁদুর গল্পে ঠিক এর বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। ইঁদুরের যাতায়াতকে সৈনিকের পদক্ষেপের সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি—'চোখের সামনেই, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সুচতুর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মতো ওরা ঘুরে বেড়ায় ......।' অর্থাৎ ইঁদুর যেন গল্পের প্রথমেই দুর্বলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

আমরা বুঝে নিই সোমেন চন্দের ইঁদুর নিরীহ জীব মাত্র নয়। এই প্রাণীটি বিপদের সামনে 'অনায়াসে টুক করে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। রাত্রিবেলায় তারা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ইঁদুরের প্রতি গল্পকথকের নানা মন্তব্যের খণ্ড খণ্ড অংশগুলি যেমন—ইঁদুরের 'সাহস দেখে', 'অনায়াসে টুক করে', 'ভয়ংকর', 'বুড়ো আঙুল', 'রাতের আসর খুলে', 'তাড়নায়' ইত্যাদি ইঁদুরের তীক্ষ্ণ দৌরাত্ম্যকে স্বীকার করে, পাশাপাশি গল্পকথকের অসহায়ত্বকেও। ইঁদুরের কার্যকলাপে সুকুমারের চোখ কপালে উঠে গেছে। তিনি

ভেবেছেন—'ভাবছি ওদের আক্রমন করার এমন কিছু অস্ত্র থাকলেও সেটা এখনও কেন যথাস্থানে প্রয়োগ করা হচ্ছে না? একটা ইঁদুর মারা কলও কেনার পয়সা নেই? আমি আশ্চর্য হব না, নাও থাকতে পারে।' তবে কি পয়সার অভাবে ইঁদুর মারা কল জুটবে না। ইঁদুরের অত্যাচার নির্বিবাদে সহ্য করে যাওয়াটাই কি ভবিতব্য? তাহলে কি দারিদ্র্যই ইঁদুরের রূপ ধরে গল্পকথককে উত্যক্ত করছে?

ইঁদুরদের কাজই হল মানুষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া। গল্পকথকের মা ইঁদুরকে ভীষণ ভয় পান। ছোট ইঁদুরকেও ভালুকের মতন ভয় করেন। ঘৃণা ও ভয় করেন ইঁদুরের গন্ধকে। প্রসঙ্গক্রমে গল্পকথক আরও দুটি ঘৃণ্য জীবের কথা বলেছেন যাদেরকে দেখে অনেকে ভয় পান, যেমন— কেঁচো ও মাকড়সা। গল্পকথক স্বয়ং জোঁক দেখে ভয় পান। প্রসঙ্গক্রমে গল্পকথক মামাবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গরু চরানোর গল্প উত্থাপন করেছেন। সেখানে বন্ধু ভীম তাঁর গায়ে জোঁক ছুড়ে দিয়ে ভয় দেখাতে চাইতো। ঐ ভীমের সাহস দেখে গল্পকথক অবাক হন ঠিক তেমনি, যেমন আজকে ইঁদুরের সাহস দেখে তিনি অবাক হন। গল্পকথক এই ভয়ের সম্পর্কে ভেবেছেন—'এ সব ছোটোখাটো ভয়ের মূলে বুর্জোয়া রীতিনীতির কোনো প্রভাব আছে কি না বলতে পারিনে।' মন্তব্যটিতে একটা শ্লেষের খোঁচা আছে বলে মনে হয়। সাধারণভাবে বুর্জোয়া লোকের সঙ্গে জোঁক, মাকড়সা বা কেঁচোর সংস্রব নেই। অন্যভাবে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্তের সঙ্গে এই কীটগুলির সহাবস্থান অস্বাভাবিক নয়। তাই বুর্জোয়া মানসিকতায় ঐ কীটগুলির উপস্থিতি যতটা ভয় ও ঘৃণার কারণ; মধ্য বা নিম্নমধ্যবিত্তের কাছে ততটা নয়। বুঝে নিতে পারি এই ইঁদুর, জোঁক কেঁচো বা মাকড়সা যা ভয় বা ঘৃণা উদ্রেককারী আসলে তা সাধারণ মানুষের মানসিক, সামাজিক কিম্বা অর্থনৈতিক অন্য সমস্যাকে সূচীত করে।

গল্পকথক দু-একটি ঘটনার কথা বলে ইঁদুরের উৎপাতের চিত্রটি তুলে ধরেছেন এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গল্পকথকের নিজের এবং তাঁর মা-বাবার মানসিক টানাপোড়েনের দিকটি প্রকাশ করেছেন। গল্পকথকের মা যিনি ইঁদুরকে সবচেয়ে বেশি ভয় পান তাঁর শাড়িতেই একটি ইঁদুর আটকে গেছে। ভয় পেয়ে পুত্র 'সুকু'কে কাতরস্বরে তিনি ডেকেছেন। সুকু ইঁদুর দেখে বিরক্ত হন, বলেন—'ইঁদুরের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে আর কি? এত ইঁদুর কেন? পরম শত্রু কী কেবল আমরাই।' একথা বলাই যায়, ইঁদুর, সুকুদের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত না করে বরং অত্যাচারের আধার হিসাবে বেছে নিয়েছে। সুকু সংশয় প্রকাশ করেছেন—যদি ইঁদুর মারা কল নিয়ে না আসা হয় তবে সুকুদের আসবাবপত্র নষ্ট করা শুধু নয়, ইঁদুরেরা সুকুদেরই একদিন কাটতে শুরু করবে। যে ইঁদুর দেখে গল্পকথকের মা ভয় পান, যে ইঁদুর ঐ সব মানুষদের অস্তিত্বলোপের কারণ হতে পারে সেই ইঁদুরকে মারার জন্য সুকু কল আনার কথা বললে সুকুর মা বলে—'আহা মেরে কি হবে? অবোধ প্রাণ, কথা বতে পারে না তো!' সুকুর মায়ের ইঁদুরের প্রতি দয়া দেখানোকে

ট্রিপিক্যাল মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রকাশ ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে। সুকুকেও দেখি মায়ের প্রথম ডাকেই সাড়া দিতে সে অভ্যস্ত নয়। তবে কি তা মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সিদ্ধান্ত নেবার দ্বিধা চিত্ততাকেই স্বীকার করে?

মায়ের শাড়িতে ইঁদুরের আটকে যাওয়া, তাই দেখে মায়ের ভয় পাওয়া, সেক্ষেত্রে সুকুর ইঁদুর মারা কল কেনার ইচ্ছা প্রকাশ এবং সেখান থেকে পয়সার অভাব হেতু ইঁদুর মারা কল কিনতে না পারার ব্যর্থতা—যার মূলে লুকিয়ে আছে দারিদ্র্য। তাই সংসারের দারিদ্র্যকে বিশ বছর বয়সী সুকুমারের সীমাহীন মরুভূমির মতো মনে হয়। গল্পকার প্রতিকূল পরিস্থিতির বর্ণনায় বারবার মরুভূমির প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। দু একটি গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা গেছে। ইঁদুর গল্পের গল্পকথক তাঁর জীবনমরুভূমিতে বিন্দুমাত্র জলের আশা করেন না। তাঁদের জীবন যেন এক আশাভঙ্গের ইতিহাস— 'আমাকে আশ্রয় করেই কম আশা জন্ম নিয়েছিল! অথচ সে সব শাখাপ্রশাখা এখন কোথায়? আমি বলতে দ্বিধা করব না, সে সব শাখাপ্রশাখা তো ছড়ায়ইনি বরং মাটির গর্ভে স্থান নিয়েছে।' তাই কখনো কখনো ঐ সব মানুষগুলো বালিতে মুখ লুকিয়ে মরুঝড় থেকে উটপাখীর মতো বাঁচতে চায়। অথচ অনুভূতিশীল, বিবেকবান গল্পকথক নিজেকে নিরিবিলিতে রাখতে চাইলেও পারেন না। ইঁদুর রূপ দারিদ্র্য, বর্ণবৈষম্য তাঁকে পাগল ক'রে তোলে। কুকুর কঁকিয়ে কাঁদলে তা যেমন অসহনীয়, তেমনি ইঁদুরের উৎপাতের শব্দ যা বিশ্রী সংগীতের আকার ধারণ করে তা তাঁকে বিরক্তি উৎপাদন করে। তাই দারিদ্র্যকে জয় করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ভাবে গল্পকথক পৃথিবীর সকলকে বড়লোক করে দেবার বর প্রার্থনা করেন ঈশ্বরের নিকট— '...... হে কৃষ্ণ, এই পৃথিবীর সবাইকে যাতে একেবারে বড়লোক করে দিতে পারি তেমন বর আমাকে দাও।' একই আশায় রবীন্দ্রাথের 'পরশমনি'র সন্ধানও করেছেন তিনি। উদ্দেশ্য একটাই—দারিদ্র্যমোচন, সকলের সম অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু গল্পকথক ঈশ্বরের নিকট কোন বর পাওয়ার আশ্বাস কিম্বা পরশমণির সন্ধান পাননি। এখানেও গল্পকথক কোন সঠিক 'দিশা' পাচ্ছেন না, ফলে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য সহ্য করে যেতে হয় তাঁকে।

ইঁদুরকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় একটি ঘটনায় মায়ের ডাকে গল্পকথক দেখলেন দুধের ভাঁড়টি ইঁদুরে উল্টে দিয়ে চলে গেল। এই ঘটনায় গল্পকথক বিস্ময় প্রকাশ করেন না। গল্পকথকের বাবাও পরে দুঃখ পাননি, হননি বিস্মিতও। সুকুমার উত্তেজনা প্রকাশের প্রয়োজনও অনুভব করেননি। এ যেন প্রাণহীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক মৃতবৎ আচরণ।

ইঁদুরে দুধ নষ্ট করেছিল। আর্থিক কারণে সুকুমারদের সংসারে দুধ দুর্লভ বস্তু বলেই মনে হয়। এই ইঁদুরেরা কারা? এরা তো সেই সব জীব যারা বহুকে বঞ্চিত ক'রে, সেই বঞ্চিতদের খাবার গ্রাস করে। এই ঘটনা শোষক-শোষিতের সম্পর্কের উদাহরণ বলা যায়।

এই ঘটনায় গল্পকথকের মায়ের কান্না চাপা থাকেনি। এই কান্নাই গল্পকথককে আরও দূরদর্শী করে তুলেছে। মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি কখনো রামকৃষ্ণ কখনো বিবেকানন্দ কখনও বা অরবিন্দের উপদেশাবলীর মধ্যে অবগাহন ক'রে এই বিকৃতি থেকে মুক্তির রাস্তা খুঁজেছেন। এই প্রথম দেখলাম গল্পকথক ইঁদুরকে প্রতিরোধ করার জন্য ইঁদুর মারা কলের প্রয়োজনীয়তায় আস্থা না রেখে ক্রমশ এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য মহাপুরুষের মতবাদের উপর ক্রমশঃ বিশ্বাসী হয়ে উঠছেন। গল্পকথকের উদ্দেশ্য একটাই—'ভাবতে লাগলুম, এমন কোনো উপায় নেই যাতে এই বিকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?' বোঝা যায়, বাহ্যিক চাঞ্চল্য অতিক্রম ক'রে গল্পকথক ক্রমশঃ গভীর ও মননশীল হয়ে উঠছেন। একটা মুক্তির স্বপ্নে গল্পকথক ক্রমশঃ ভাস্বর হয়ে উঠছেন। শুধু নিজের মুক্তি নয়, বিকৃতি থেকে সমগ্র সমাজের মুক্তি।

ইঁদুরের দুধ নষ্ট করার ঘটনায় সুকুমারের বাবার প্রতিক্রিয়া অসহনীয়। এই ঘটনাটি বাবাকে বিশেষ প্রভাবিত করেনি ব'লে মনে হলেও গল্প কথকের পরক্ষণেই ভুল ভেঙেছে। তাঁর বাবার স্বাভাবিক স্বীকারোক্তিঃ 'বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে! আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলুম এমন একটা কিছু হবে। আরে মানুষের জীবন নিয়েই টানাটানি, দুধ খেয়ে আর কী হবে বলো!' কিন্তু গল্পকথকের বাবার এই মন্তব্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে তীব্র ব্যঙ্গ যা তিনি পরিবারের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেছেন। ইঁদুরের দুধ নষ্ট করার ঘটনাটি মোটেই ভালো ঘটনা বলা যায় না। এমন ঘটনা ঘটবে–আগে থেকে জেনেও গল্পকথকের বাবা ইঁদুরের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অপারগ। দুধ খাওয়া–বিলাসিতা বা অপচয় বলেই তাঁর মনে হয়। এই ঘটনার জন্য যাবতীয় পৌরুষ, ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি পরিবারের অসহায় মানুষগুলোর ওপর—'তোমরা পেলে কি? কেবল ফুর্তি আর ফুর্তি! দয়া করে আমার দিকে একটু চাও। আমার শরীরটা কি আমি পাথর দিয়ে তৈরী করেছি? আমি কি মানুষ নই? আমি এত খেটে মরি আর তোমরা ওদিকে ফুর্তিতে মেতে আছ! সংসারের দিকে একবার চোখ খুলে চাও? নইলে টিকে থাকার দায় হবে।'

পাঠকবর্গ সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন, গল্পকথকের পরিবারে ফুর্তি মরিচীকামাত্র। তবু বাবার এই অভিযোগে গল্পকথক অসহায় বোধ করেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতার ভদ্র মুখোশ সরে গিয়ে ক্রমশ বেরিয়ে পড়ে ইঁদুরের নগ্ন নখরদণ্ড। শুরু হয় গল্পকথকের বাবা মায়ের উত্তপ্ত সংলাপ—''বাবা বললেন–'আর তর্ক কোরো না বলছি! এখান থেকে যাও আমার সুমুখ থেকে যাও, দূর হয়ে যাও বলছি!'

মা বললেন, 'অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। চেঁচামেচি করে পৃথিবী সুদ্ধু লোককে নিজের গুণপনার কথা জানানো হচ্ছে, খুব সুখ্যাতি হবে।'

শুনতে পেলুম, এরপরে বাবার স্বর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে বোমার মতো ফেটে পড়ল! —'তুমি যাবে? এ'খান থেকে যাবে কি না বলো? গেলি তুই আমার চোখের সামনে থেকে? শয়তান মাগি' ....।''

মনে হল গল্পকথকের বাবা মায়ের সম্পর্কের সেতুটি ইঁদুরে যেন কেটে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর 'তুমি' থেকে 'তুই' কিম্বা 'তুই' থেকে 'শয়তান মাগি'-তে অধঃপতিত হওয়ার জন্য মুহূর্তকাল সময় নষ্ট হয় না। সাবালক পুত্র মায়ের এই অপমানে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করেন মৃতবৎ হয়ে। সুকুমারের কিছুই করার নেই। তাঁর দুটো হাত কেটে কেউ যেন ভাসিয়ে দিয়েছে জলে। চোখকে করেছে বাষ্পাকুল। একসময় মা তাঁর ঘরের মেঝেয় এসে শুয়েছেন। আর সুকুমারের কল্পনায় ধরা পড়েছে স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। এমন হতে পারতো বিশ বছরের সুকুমার লণ্ডনের ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন কিম্বা খেলার মাঠে প্রচুর নাম করেছেন। তাঁর কাছে ইংরেজ মহিলা এসে প্রেম নিবেদন করছে—এমন ঘটনাও অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু অমলকান্তি যেমন রোদ্দুর হতে পারেনি তেমনি সুকুমারও পারেনি অসাধারণ হয়ে উঠতে। তাই তিনি তাঁর মাকে অসহায়ভাবে শুয়ে থাকতে দেখেন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রবঞ্চনা, অর্থনৈতিক অসহায়তা 'ইঁদুর' গল্পটিকে উজ্জ্বল করেছে। অনেক রাত্রে মা রান্না চাড়ালে গল্পকথক মাকে এত দেরীর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি চুপ করে থাকেন। গল্পকথকের উপলব্ধি—'বুঝতে পারলুম সেই এক কাসুন্দি। বুঝতে পারলুম এ জিনিস সহজে এড়াতে চাইলেও সহজে এড়াবার নয়,—ঘুরে ফিরে এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়, পাশ কাটাতে চাইলে হাত চেপে ধরে, কোনো রকমে এড়িয়ে গেলেও হাত তুলে ডাকতে থাকে।' ইঁদুর যেমন সুকুমারকে নাস্তানাবুদ করে থাকে, দারিদ্র্যই যেন তাই। কোনভাবেই এর থেকে নিষ্কৃতি নেই। গল্পকথক এখানে তাই কলাকৈবল্যবাদকে পরিহাস করেছেন। শৌখিন পাঠকদের ব্যঙ্গ করেছেন। কেননা এদের কাছে দারিদ্র্য, কান্নাকাটি 'ন্যাকামি' ছাড়া আর কিছু নয় বলে মনে করেন গল্পকথক। মধ্যবিত্ত সমাজ যেমন চরম সত্যকে উপলব্ধি করেও স্বীকার করেনা, তাদের মধ্যে রয়ে যায় যেমন 'পাছে লোকে কিছু বলে'র মানসিকতা, তেমনি গল্পকথকের নিজের বাবার কিম্বা রক্ষিতমশাইকে সেই মানসিকতার মানুষ বলেই মনে হয় গল্পকথকের। তাঁর বাবা চরম দারিদ্র্যকে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে থাকেন। রক্ষিত মশাই ঘরের অভাব ঢাকা দিতে বাইরে রাজা উজির সাজেন। প্রেস কর্মচারী মদন দারিদ্র্যকে উপবাস রূপে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেন। আসলে এই আত্মপ্রবঞ্চক মধ্যবিত্ত দুঃখের সমুদ্রে গলা পর্যন্ত ডুবে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে গল্পকথকের আরও উপলব্ধি ঃ "এরা কে জান? এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বটে, কিন্তু না খেয়ে মরে। যে ফুল অনাদরে শুকিয়ে ঝরে পড়ে মাটিতে এরা তাই। এরা তৈরী করেছে বাগান, অথচ ফুলের শোভা দেখে না। পেটের ভিতর সুচ বিঁধছে প্রচুর, কিন্তু ভিক্ষাপাত্রও নেই। পরিহাস! পরিহাস! —' এইভাবে মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতার দিকটি উন্মোচন করেছেন লেখক।

মায়ের প্রতি বাবার অশালীন আচরণের যে চিত্র এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সচেতন পুত্রের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, চব্বিশ ঘণ্টা পরে সেই পুত্রের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে অপর এক

বিস্ময়কর চিত্র—''মধ্যরাত্রির ইতিহাস আরও বিস্ময়কর। .... শুনতে পেলুম বাবা অতি নিম্নস্বরে ডাকছেন 'কণক, ও কনক ঘুমুচ্ছো?'

তখন মধ্যরাত্রে আকাশে চাঁদ উঠেছে। পৃথিবীর গায়ে সাদা মসলিন কাপড় জড়িয়ে দিয়েছে কেউ। 'তুমি' থেকে 'তুই'। 'তুই' থেকে 'শয়তান মাগি', তা থেকে মিষ্টি গলার ডাক 'কনক, ও কনক'—শত অনটনের মধ্যেও মানবের এই ক্রমবিবর্তনের ধারা যেন মরেও মরে না। তাই বাবা মায়ের মধুর মিলনের ফলশ্রুতি—'পরদিনকার প্রাণখোলা হাসিতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠলুম। হাসির ঐশ্বর্যে বাড়ির ইটগুলিও কাঁপছে।'

এরপর গল্পকথকের বাবা গল্পকথকের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় তিনি সুকুমারকে সমাজতন্ত্রবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করেছেন, হিটলারের জয়গান গেয়েছেন। কেননা তাঁর মনে হয় হিটলারের সঙ্গে সাধু লেনিন পেরে উঠবেন না। এসকল কথায় অবশ্য সুকুমারের সমাজতন্ত্রবাদের বিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরে না। সুকুমারের বাবা আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রসঙ্গ ছেড়ে মন্টুর ছেঁড়া প্যান্ট নিয়ে রঙ্গরসিকতা করেছেন। হাসিতে গুম গুম করে উঠেছে গোটা ঘর। মৃতপ্রায় মানুষগুলো যেন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠেছে—'ভাবলুম আনন্দের এই নির্মম মুহূর্তগুলি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে খুশির আর অন্ত থাকে না! মানুষ-মানুষ হয়ে ওঠে।' তার পর রান্নাঘরে ঢুকে গল্পকথকের বাবা তাঁর মাকে রান্নার বিষয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। অতীত জীবনের প্রসঙ্গে তাঁরা ফিরে গেছেন। বিয়ে করার জন্য গল্পকথকের মাকে তাঁর বাবার দেখতে যাবার সরস বর্ণনা জীবনের সমস্ত গ্লানিকে দূর করে দিয়েছে।

'ইঁদুর' গল্পে ইঁদুরের উৎপাত এবং তা থেকে একটি পরিবারের দুঃসহ উপলব্ধি গল্পটিতে প্রাধান্য পেলেও গল্পকথক সুকুমারের মানসিক ক্রমবিবর্তনের ধারা মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। ইঁদুরের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মানুশীলন ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রবাদকে অবলম্বন করেছেন সুকুমার। অথচ এই সুকুমার ইঁদুর মারা কল কেনার পক্ষপাতি ছিলেন সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য। অলৌকিকভাবে সমস্যার সমাধানের কথা ভেবেছিলেন তিনি কখনো কৃষ্ণ, কখনো বা রবীন্দ্রনাথের 'পরশমনি' কেন্দ্র করে। বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ বা অরবিন্দের উপদেশাবলীর মধ্যেও মুক্তি খুঁজতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত সঠিক পথ খুঁজে পাননি। কিন্তু একদিন অলস মধ্যাহ্নে সুকুমার সঠিক রাস্তার সন্ধান পেলেন—''ভাবনার রাজ্যে পায়চারি করে আমি আমার মীমাংসার সীমান্তে এসে পৌছলুম সেই মধ্যাহ্নে, সেখানে রাখলুম দৃঢ় প্রত্যয়।'' তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল এক কর্মমুখর গতিশীল সমাজ। যেখানে বিজ্ঞানের সহায়তায় কৃষি ও শিল্পে মানুষ এগিয়ে চলেছে সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে।

সুকুমার শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছেন রেলওয়ে কর্মী সংগঠনে, বৃহৎ জনগণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত ক'রে সমস্ত অসহায়ত্ব থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেছেন। সুকুমারের অভিজ্ঞতায়—'ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলুম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলুম জনতার দিকে, তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলুম। তাদেরও ধন্যবাদ, যারা আমাকে আমার এই অসহায়তার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে।' শশধর ড্রাইভারের সাহেবের মুখের উপর ইউনিয়ন করার অঙ্গীকার, মিছিল, মিটিং, কৃষক ও মজদুরের ঐক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা—এককথায় সুকুমারকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিয়েছিল। বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সুকুমার কলকারখানার ইঞ্জিনকে ধ্যানমগ্ন মানুষ মনে করেছিলেন। এসব কিছুর ফলশ্রুতি 'সাম্যবাদের গর্ব, তার ইস্পাতের মতো আশা, তার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলুম।'

সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর 'সোমেন চন্দের ছোটগল্প ঃ জীবনবোধ ও শিল্পরূপ' প্রবন্ধে বলেছেন— ".... পুঁজিবাদী সমাজের এই নিচের স্তরটির শিরায় শিরায় বেড়ায় ইঁদুরের আক্রমন, একটি ইঁদুর মারা কল কেনার পয়সারও অভাব। অবশেষে কোনোক্রমে কয়েকটি ইঁদুর ধরা পড়েছে বলে সেই ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্নভাবে বড় করে দেখা—আসলে কোনো প্রতিকারই যাতে হবে না। কিন্তু এই গল্পের বক্তা-চরিত্র সুকুমার এই বিষ-বৃত্তের বাইরে যাবার পথ কাটে। রেল শ্রমিক সংগঠনে সে দেখে এসেছে নতুন কালের কর্মী মানুষের সংকল্প। গল্পটি ঘুরে এসে আবার বন্দী ইঁদুর ধরার গর্বে উল্লসিত সুকুমারের পিতার ছবিতে শেষ হয়েছে। লেখক গল্পটির শেষ বিন্দুতে সত্যের ছবিই রেখেছেন, স্বপ্নের ছবি নয়।"

আমরাও দেখি, গল্পের শেষে ইঁদুর মারা কলে মাত্র কয়েকটি ইঁদুর ধরা পড়েছে। সেইজন্য গল্পকথকের বাবার, নারু, মন্টু বা অন্যান্য ছেলেপিলেদের উল্লাস। সেখানে গল্পকথকের বাবা বোকার মতো হাসেন। দেখা যায় সেখানে তিনি ছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক আর কেউ নেই। বোঝা যায় সঠিক রাজনৈতিক চেতনার অভাবও ইঁদুরের সঙ্গে সমীকৃত হয়ে গেছে। পাঠক সহজেই বুঝে নিতে পারেন প্রকৃত ইঁদুর মারা কলের সন্ধান সুকুমারই পেয়েছেন, তাঁর বাবা নন। তাই পাঠকের যাবতীয় প্রত্যয় সুকুমারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাই ছোট গল্পটির পরিণতি সত্যের ছবির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত পাঠকের কাছে সুকুমারের স্বপ্নই সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।